Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-II, published on April 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজম : কিন্নর রায়ের নয়ের দশকের গল্প

অনামিকা মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপিকা, মঙ্গলকোট গভঃ কলেজ
ইমেইল:-anamikamlp@gmail.com

Keyword
জাদুবাস্তববাদ, ম্যাজিক রিয়ালিজম, পরাবাস্তব, বুর্জোয়া সমাজ, ফ্লাশব্যাক, রেশনিং, সিভিল সাপ্লাই, কালোবাজার

Abstract
জাদু বলতে বোঝায় অ-সাধারণ সংঘটন, ভৌতিক বা বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতীত কোনো ঘটনা। জাদুবাস্তববাদে 'জাদু' কথাটি জীবনরহস্য অর্থেই আসে, ভূতের আবির্ভাব লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অ-সাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত আবহ এ-সবই আনা হয় বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। জাদুর খেলা, জাদুকরের কারসাজি-জাদু বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। বাস্তববাদ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জরুরি ব্যাপার। আর বাস্তববাদের সূত্রে আসে পরাবাস্তববাদের কথা। জাদুবাস্তব এবং পরাবাস্তব এ-দুটোই সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন কিন্তু পরাবাস্তব বাস্তব সাহিত্যের প্রতি খড়গহস্ত, কারণ তা বুর্জোয়া সমাজের ধারণা, কিন্তু জাদুবাস্তব বাস্তবকে অবজ্ঞা করে না। বাংলা সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের আলোচনা করতে গেলেই স্মরণে আসে কিন্নর রায়ের কথা।

ভূমিকা : পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ছোট আকারের গল্প অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। কিন্তু 'ছোটগল্প' নামক বিশেষ রূপের গল্প লেখা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অসংখ্য পত্রিকার উদ্ভবের ফলেই ছোটগল্পের রূপ ত্বরান্বিত হয়। বাংলায় প্রথম ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। এর পর নগেন্দ্রনাথ বসু। ছোটগল্পের রূপের বিবর্তনের ইতিহাসে প্রাক-রবীন্দ্র গল্প ধারায় এই দু'জনের নাম সর্বাগ্রে উচ্চার্য। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের 'রূপ' একটি বিশিষ্টতা অর্জন করল। রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকেই বহু লেখক এই নবীন শিল্পরূপটিকে পরিচর্যা করতে থাকেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত সমাজে যে সুস্থিতি ও ভারসাম্য ছিল তার প্রতিচ্ছবি দেখি এই পাঁচ ছোটগল্পকারের মধ্যে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ছোটগল্পের বিষয় হিসাবে এল বিশ্বসমর-পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, ব্রিটিশরাজ বিরোধী আন্দোলন, মন্বন্তর, সামরিক আয়োজন, রেশনিং, সিভিল সাপ্লাই, কালোবাজার, কন্ট্রোল, বন্যা, মড়ক, গ্রামসমাজের ভাঙন-জনিত সামাজিক অস্থিরতা, সমরোত্তর দাঙ্গা, দেশবিভাগ, রক্তাক্ত স্বাধীনতা ও বাস্তুহারার স্রোত-জনিত বিপর্যয়, মূল্যবোধের অবনমন, বাস্তুহারা ও ধর্ষিতা নারীর কান্না , বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ, ম্যাসাজ ক্লিনিকে যোগদান, কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তার সুফল কুফল। তৃতীয় দশক থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালপর্যন্ত

আমরা পেয়েছি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, যুবনাশ্ব, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা গুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ গল্পকারকে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমরা পেলাম বেশ কিছু নতুন লেখককে। তাঁদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুরীর নাম সর্বাগ্রে উচ্চার্য।

"১৯৪৮ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে তাঁর সাতটি গল্পের বই বেরিয়েছে। ষাট–সত্তরটা গল্প লিখেছেন সতীনাথ। সবগুলিই অপ্রেমের গল্প। বিষয় বৈচিত্র, গঠন-নৈপুণ্য, ঘটনা বিন্যাস, কাহিনী সংস্থাপন ও ভাষা-ব্যবহারে সতীনাথের গল্পগুলি যে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।"[১]

পঞ্চাশের দশকের শেষে ষাটের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পে নতুন আন্দোলন দেখা গেল, যার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল 'ছোটগল্প নতুন রীতি'। সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল কর, বাংলা ছোটগল্পে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল বিমল করের গল্পে। পরে যাঁরা গল্প লিখলেন সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, মতি নন্দী, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, সমীর রক্ষিত, আনন্দ বাগচী, বুদ্ধদেব গুহ, সত্যেন্দ্র আচার্য, সমরেশ মজুমদার, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ অন্যতম। এঁদের- "ব্যবধান কেবল মানসিকতায় নয়, ভাষায় ও আঙ্গিকে; কেবল জীবনদৃষ্টিতে নয়, জীবনের নানা উপকরণের অভিনব ব্যবহারে।"[২]

সত্তর আশির দশকে যেমন পাই বেশ কিছু নতুন গল্প লেখককে তেমনি পূর্ববর্তী গল্প লেখকেরা প্রবলভাবে উপস্থিত। পূর্ববর্তী লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন আছেন মহাশ্বেতা দেবী, অসীম রায়, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, দেবেশ রায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, তপোবিজয় ঘোষ, অভ্র রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। তেমনি নতুন লেখকদের মধ্যে আছেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আবুল বাসার, অমর মিত্র, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, কিন্নর রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সেন, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, বাণী বসু প্রমুখ। "সত্তর-আশির দশক থেকেই বাংলা ছোটগল্প বদলাতে শুরু করে। রূপ, রীতি, ফর্ম, টেকনিক, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন-জিজ্ঞাসা সবকিছুই বদলে যেতে থাকে। নবীন প্রবীণ সব গল্পলেখকের গল্পে এই বিবর্তন ধরা পড়তে থাকে।"[৩]

জাদু বলতে বোঝায় অ-সাধারণ সংঘটন, ভৌতিক বা বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতীত কোনো ঘটনা। জাদুবাস্তববাদে 'জাদু' কথাটি জীবনরহস্য অর্থেই আসে, ভূতের আবির্ভাব লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অ-সাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত আবহ এ-সবই আনা হয় বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। জাদুর খেলা, জাদুকরের কারসাজি-জাদু বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। বাস্তববাদ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জরুরি ব্যাপার। আর বাস্তববাদের সূত্রে আসে পরাবাস্তববাদের কথা। জাদুবাস্তব এবং পরাবাস্তব এ-দুটোই সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন কিন্তু পরাবাস্তব বাস্তব সাহিত্যের প্রতি খড়গহস্ত, কারণ তা বুর্জোয়া সমাজের ধারণা, কিন্তু জাদুবাস্তব বাস্তবকে অবজ্ঞা করে না। বাংলা সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের আলোচনা করতে গেলেই স্মরণে আসে কিন্নর রায়ের কথা।

"লাতিন-আমেরিকার ম্যাজিক-রিয়ালিজম-জাদু-বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই তিনি একাজ তাঁর নিজের মতো করে গেছেন বাংলা গল্প উপন্যাসে।"[৪]

'রেলচাকুরে–সৎ নির্লোভ বাবা শিখিয়েছিলেন - স্রোতের বিপরীতে যারা সাঁতার কাটে, মানুষ তাদেরই মনে রাখে।' বাবার কথা স্মরণে রেখেই কি কিন্নর রায় স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে শুরু করেন? নাকি জীবন তাঁকে শিখিয়েছে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা? তিনি কি আদৌ বিপরীতে সাঁতার কেটেছেন? নাকি আর পাঁচটি গল্পকারের মতোই কাটা খালেই তাঁর গতি?

সত্তরের দশকের শেষ দিকে জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কিন্নর রায় গল্প লিখতে শুরু করেন। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্পই প্রকাশিত হয় নয়ের দশকে।'দর্পণে নীল'(২০০০),'মায়াযান'(১৯৯৮),

'মহাজাগতিক'(১৯৯৮), 'কথাসাহিত্যিক'(১৯৯৬) তার অন্যতম। জাদুবাস্তবতায় মোড়া এই সব গল্প পাঠককে টেনে নিয়ে যায় অন্য এক অনুভূতিলোকে। এই গল্পগুলি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য- "পৃথিবীতে সেই অর্থে বাস্তব, সত্য বলতে কিছু নেই। গত কুড়ি -বাইশ বছর ধরেই এটা আমার মনে হয়। আজ যা বাস্তব, সত্য, তত্ত্বের বিচারে প্রতিষ্ঠিত আগামী কালই তা ছেঁড়া ঠোঙা।থাকে কল্প-ঐশ্বর্য। কল্পনা। বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার যথাযথ মিশেল তৈরি করে শিল্প। সিনেমা, সঙ্গীত,থিয়েটার,ছবি, আঁকাআঁকা-সবক্ষেত্রেই এটি বোধহয় প্রযোজ্য। আজ যে সত্য, দার্শনিক বিশ্বাস নিয়ে বাঁচি আগামীকাল তা জীর্ণ হয়ে যায়।ফলে কল্পনা যা হলেও হতে পারে
এমন একটা কিছুকে বানিয়ে তোলা।"[৫]

তাঁর গল্পগুলি যে ব্যতিক্রমী তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন এইভাবে-"এই তো গল্প। যার শুরু নেই। শেষও না। দারুণ সাসপেনস, টানটান লেখা। বেশ ঘন জমাট প্লট। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নায়ক। হাইট ভালো, সুন্দর দেখতে। সাহসী বুদ্ধিমান। গান জানে, যেন পঞ্চাশের বাংলা ছবির উত্তমকুমার। সে রকমটি আমার হয় না।"[৬]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-"এখন যাঁরা গল্প উপন্যাস লিখেছেন সেই সমস্ত অপ্রবীণ অথচ অতরুণ লেখকদের মধ্যে কিন্নর রায় আপন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে অনন্য।"[৭]

কিন্নর রায় লেখেন কেন? তার উত্তরে তিনি জানিয়েছেন- "সেই পঁচাত্তর/ছিয়াত্তর থেকে লিখতে লিখতে এরকম মনে হয়েছে-আসলে একজন লেখক তাঁর ইচ্ছাপূরণ, না-পাওয়া, স্বপ্ন সবকিছুই মেলে ধরেন গল্প-উপন্যাস-কবিতায়। তাঁর জীবনযাপন, গ্লানি, মিথ্যাচার -এ সবই লেখার বিষয় হয়ে ওঠে।"৮

কিন্নর রায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রথযাত্রা'। 'কিন্নর রায়ের ছোটগল্প' সংকলনে লেখকের ভূমিকায় গল্পকার তাঁর গল্প রচনার উৎস সম্পর্কে জানিয়েছেন, "... মানুষ প্রশ্ন করতে চায়। তার সামনে এক চিরকালীন জিজ্ঞাসা। রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহাকাশ, অনন্ত সময়, বহু যুগের প্রাচীন সব নক্ষত্ররা। সেই তারার আলোয়, রোদে, বোরের বাতাসে জীবন করে মানুষ। আনন্দ পায়, বিষাদে ডোবে, আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গল্প তো এরকমই, কারণ তা জীবন ঘিরেই।কেন দুঃখ, কেন আনন্দ, কেন জন্ম, কেন বেঁচে থাকা, কেন নিসর্গের মায়া, কেনই বা এখনো নারীর রূপমুগ্ধতায় নিজেকে কখনো কখনো বিপন্ন করে তুলতে ইচ্ছে করে - এই সব প্রশ্ন যদি উসকে দিতে পারি নিজের লেখালেখিতে – গল্পে, উপন্যাসে, তাহলে বোধহয় পেরে ওঠা গেল, এমনটি মনে হয়।"

নানা সময়ে কিন্নর পাঠককে জানিয়েছেন, কেবল প্রতিভা দিয়ে, আবেগ দিয়ে লেখা হয় না। চাই অভিজ্ঞতা, নিরন্তর পড়াশনা, আর কল্পনাশক্তি। ঐখানেই লুকিয়ে আছে লেখকের মূল চিন্তাভূমিটি। কল্পনাশক্তি যে কী চূড়ান্ত শিল্পরূপ নিতে পারে তার অসাধারণ উদাহরণ তাঁর লেখা 'মায়াযান', 'কথাসাহিত্যিক', 'দর্পণে নীল' ইত্যাদি গল্পগুলি। লেখক 'মায়াযান' গল্পে বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ দুই প্রকৃতিপ্রেমীকে মৃত্যুর বহু বছর পর ফিরিয়ে ঘাটশিলার পথে সংলাপরত করেছেন। কী চমৎকার, বিশ্বস্ত সেই সব সংলাপ।

"তবু তো আপনার বাড়ি আছে ঘাটশিলায়। গোপালনগরে। গোপালনগরের বাড়ি তো বেশ ভালোভাবেই রাখা আছে। কিন্তু আমার। কোথায় বাড়ি। কোথায় ঘর। বসে লেখার জায়গা অব্দি নেই ঠিক মতো। বাণী রায়ের ঘর দেখে মনে হতো, লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কী লিখবার আছে। আহা এই ঘরখানা যদি পেতাম। বাসাবাড়ির পাশের ঘরে সেই মহিলা, তার ঘরে দিনরাত হুল্লোড়। উপভাড়াটিয়া মহিলার ঘরে জটিল 'জনসমাগম' আর হৃদয়হীন চিৎকার। সে যন্ত্রণা আপনাকে বোঝাতে পারব না। তাঁকে তোলার জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হুমায়ুন কবির, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়- সকলের সাহায্য চেয়েছি। গোপাল চন্দ্র রায় নিয়ে গেছেন উকিলের কাছে।"[৯] 'মায়াযান' সম্পর্কে লেখক লিখেছেন- 'মায়াযান লেখার আগে ঘোর ছিল। এই ট্রান্স-আচ্ছন্নতা না হলেও লিখতে পারি না। জীবনানন্দ বিভূতিভূষণ একই পৃথিবীতে বেঁচেছেন। একই অক্সিজেনে শ্বাস নিয়েছেন। কিন্তু যাকে আমরা বাস্তব বলি, সেই পটভূমিতে ওঁদের দু'জনের দেখা হয়নি। অন্তত বিভূতিবাবুর দিনলিপি বা জীবনানন্দ দাশের ডায়েরিতে কোথাও তার উল্লেখ নেই। আমার মনে হয়েছিল এই দুই অনন্ত পথের যাত্রীকে যদি মিলিয়ে দিতে পারি, যদি পারি। জানিনা পেরেছি কিনা তবে চেষ্টা করেছি।"[১০]

বাস্তব থেকে কল্পনার দিকে চলে যাওয়া কিংবা অতীতচারিতা কিন্নর রায়ের এক ধরনের নেশা। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই, কী ছোটগল্প, কী উপন্যাসে। 'দর্পণে নীল' গল্পে দেখি-

"কোলকাতা থেকে অমল সরকার, আর কাটোয়া থেকে বাবুল রায়চৌধুরি, সমীর পণ্ডিত আসে গোয়াই গ্রামের নীলকুঠি দেখতে। সমীর আর অমল একই কোম্পানিতে কাজ করে। নীলকুঠি দেখার আগে নীলকুঠি এবং নীলচাষ সম্পর্কে জানতে তারা আসে অনিলবাবুর কাছে। কিন্তু অনীলবাবু বাড়ি নেই। অগত্যা অনীলবাবুর ভাই অধীরবাবুর কাছে নীলের গল্প শোনে তারা। অনীলবাবু ছোটবেলায় নীলের বড় বড় চিমনি দেখেছে। দূর থেকে দেখা যেত দশ ফুট চিমনি। সাহেবরা যে বাড়িতে থাকতো সে বাড়ি আর নেই, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এখন সেখানে কলাবাগান। শুধু সিমেন্ট বাঁধানো একটা চাতাল আছে। বড় বড় নীলের চৌবাচ্চা যেখানে নীল পচান হ'ত। মাটির ইঁট তৈরির যেমন ছাঁচ হয়, তেমনই নীল তৈরির ছাঁচ ছিল। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর তারা যায় নীলকুঠি দেখতে, নীলকুঠির পাঁচিলে ওঠে তারা। হঠাৎ 'কালী প্রতিমার খোড়ো কাঠামোর পাশ থেকে হঠাৎই একটা লোককে ভেসে উঠতে দেখল বাবুল। পাকা মাথা। সামান্য ঝুঁকে হাঁটে। হাতে বাঁশের লাঠি।' লোকটি এসে দাঁড়ায় পাঁচিলের সামনে। ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে 'পাঁচিলের ওপর তোরা কারা?' বাবুল বলল তারা কাটোয়ার লোক, নীলকুঠি দেখতে এসেছে। লোকটি তার পরিচয় দিল সে তারু ঘোষ, নীলদর্পনের তোরাপ। মরে গিয়েও সে বেঁচে আছে। 'নীলকুঠির ভাঙা পাঁচিলে বড় একটা পাখি হয়ে উড়ে নামল তারু ঘোষ। তার ওপর মাড়ির দাঁত পড়ে যাওয়া ফাঁকাটুকু আবারও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সমীর পণ্ডিত। খাপচা খাপচা শাদাটে দাড়ি মোড়া ভাঙা গাল। কষের দু'পাশ দিয়ে আবছা ফেনা নামছে। বাঁ হাতে গাল বাজিয়ে 'বু বু বু' শব্দ করছে তারু ঘোষ। তার ডান হাতে পাকান বাঁশের লাঠি"।[১১] এই ভাবেই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশে যায় তাঁর গল্পে।

শুরু থেকেই শ্রমশ্রাদ্ধ তাঁর লেখা। 'আজও সাহিত্যের জগতে খাপছাড়া সঙ্গীহীন নির্জন শ্রমিক মাত্র তিনি'। আর তাঁর কোন লেখাই প্রিডিটারমিনড নয়, নতুন তৈরি করা কিছুটা আবছা কুয়াশাময়, কিছুটা অভিজ্ঞতার আশ্চর্য মিশেল। 'তিনি যে গোলগাল গল্প লিখতে চান না তা হাবে ভাবে বহুবার বুঝিয়েছেন।' অপেক্ষাকৃত নবীন লেখক কিন্নর রায়ের গল্প, উপন্যাসগুলোর বিশেষ আকর্ষণ বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। সচরাচর যেসব বিষয় নিয়ে বিশেষ কেউ লেখেন না-কারণ লিখলে বাজারি সাফল্যের সম্ভাবনা কম-কিন্নর রায়ের আগ্রহ যেন সেগুলির প্রতিই বেশি।

সংমিশ্রন চরিত্র নিয়ে বহু লেখক বহু গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। তবে কিন্নর রায়ের রচনা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং সেগুলি খাঁটি মুসলিম চরিত্রকে নিয়ে লেখা। মুসলিম সমাজ, জীবন, ধর্মীয় ব্যাপার, গোপন সমস্যা, যাবতীয় বিষয় নিয়ে সূক্ষ ব্যাখ্যা, নিখুঁত বর্ণনা আর অন্তরের দরদ ঢেলে চরিত্রগুলোর অঙ্কন-এ সবই যেন বুঝিয়ে দেয় কিন্নর রায় মুসলিম সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কিংবা মুসলিম সমাজের দর্পণ। কিন্নর রায়ের লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাকে তিনি যথেষ্ট মূল্য দেন। এইসব গল্প, উপন্যাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এ গল্পকার, ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতাঋদ্ধ। আর এইসব অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর দেখার ধরনে ও কল্পনার সংহতিতে বাঁধতে চান। মাঝে মধ্যে সেটা হয়তো হয় না-অভিজ্ঞতা একটু বেশি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু যখন সেটি তাঁর গল্প, উপন্যাস হয়, তখন তা একেবারেই তাঁর গল্প কিংবা উপন্যাস হয়ে ওঠে। যাকে বলা হয় 'ডিকশন'। সেই রচনাশৈলীতে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের ছাপ এমনভাবে মুদ্রিত থাকে-বুঝতে অসবিধা হয় না, এর লেখক কিন্নর রায়।

গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝতে চেয়েছেন মার্কস–এঙ্গেলস, লেলিন-স্তালিন, মাও, হো-চি-মিন-দের সঙ্গে ফ্র্যানজ ফ্যানন, হারবার্ট মার্কুইজ, রেজি দেব্রে, চে গেভারা, ফিদেল কাস্ত্রোদের। পাশাপাশি বুঝতে চেয়েছেন বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন, সাংখ্য দর্শন, কপিল মুনি ও চার্বাকপন্থীদের প্রসঙ্গ, মহাভারতের দুর্যোধন-সখা বস্তুবাদী চার্বাকের সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত-চার্বাকদের প্রসঙ্গও। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ, বৌদ্ধ শ্রমণ, অর্হত, ভন্তেদের জীবন, জৈনদের প্রায়োপবেশন-খাবার, জল-সব বন্ধ করে নিশ্চিতভাবে স্বেচ্ছা মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া-তাঁদের শ্বেতাম্বর, দিগম্বর সম্প্রদায়, জৈন-মুনিরা-এই সমস্ত জীবনচর্চাকেই জানতে চেয়েছেন তিনি। হীনযান, মহাযান, সহজযান, বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের নানা ধারা-

উপধারার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ দেব-দেবী-বজ্রতারা, হৈহেয়, হারীত, পর্ণশবরী, মারীচী, জাঙ্গুলী-মূলত এঁরা বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবী- দেবতা, তাঁদের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন বিশদে। যার নির্যাস 'নির্বাণ', 'বোধিসত্ত্ব' প্রমুখ গল্প।

কিন্নর রায়ের অধিকাংশ লেখা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে, বেশির ভাগটা মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যা সংক্রান্ত। 'মেঘজান' গল্প (১৯৯৫) একটি মুসলিম পরিবারের কাহিনি। মেঘজান বিবির জীবন কাহিনি উঠে এসেছে তারই স্বগত চিন্তায়, স্বপ্নে-'কাল শেষ রাতে স্বপ্নে আসিফকে দেখার পর মেঘজান মনে করতে পারে বোধ হয় বছর পঁয়ত্রিশ আগে তার ছেলেটি বাঁশতলায় কবরের নিচে চলে গেছিল।' শেষরাতে স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝে আসা যাওয়া ছেলেকে যেমন দেখে, তেমনি দেখে তার সেই পালতু বেঁজিটিকে যার নাম নসিব। মেঘজান বিবির এ দীর্ঘ জীবনের কত কথা, কত মান অভিমান লাঞ্ছনার ঘটনা মনে পড়ে। তার স্বামী, ভাসুর ও দেওরদের কথা মনে পড়ে। সে কীভাবে প্রহৃত, লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হয় তাদের দ্বারা–তাও মনে পড়ে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষের সমস্যাও উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। 'নির্বাণ' গল্পে বাঙালি বৌদ্ধ সুকুমার বড়ুয়ার দাবি- " আমরা বড়ুয়ারা, বাঙালি বুডডিস্টরা ভেরিমাচ নেগলেকটেড। ...আমরা-এই বাঙালি বুডডিস্টরা সেভাবে ফেসিলিটিজ পাই না কোন। চাকরিতে রিজার্ভেশান কোটা বাড়ান দরকার। ...এই যে বড় ভন্তে মারা গেলেন। তাঁর পার্থিব শরীর এতদিন রাখা ছিল বিশেষ যত্নে। তারপর আজ যে দাহ-সংস্কার হবে, তার কোন খবর দেয় না মিডিয়া। ...আমরা-বৌদ্ধরা এখনও ভোটের ব্যালেনসিং ফ্যাকটার হতে পারি নি বলেই কি এই নেগলিজেন্সি?"[১২]

পটুয়াদের সমস্যা নিয়ে গল্প লিখেছেন কিন্নর রায়। গল্পের নাম 'উপমহাদেশ'। 'হিন্দু নামের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানি নাম একটা রাখতে হয়। আমরা পটুয়া শিল্পী।' যেমন সুলেমান শুকদেব, রাধেশ্যাম-রহিমতুল্লা, জাবেদ-বিষ্ণুপদ, ওসমান-দুখুশ্যাম, জুম্মন-গুরুপদ, ইসমাইন-বনমালী, বাহার-রঞ্জিত, তাজমহম্মদ-ননীগোপাল, জাবেদ আলি-আনন্দ, জৈগুন-কাজল, খাতুন-লক্ষ্মী, রক্ষামণি খালেদা - মেদিনীপুরের নয়া গ্রামের প্রতিটি নারী পুরুষের দুটি করে নাম, অবশ্যই তা জীবিকার প্রয়োজনে। কারণ পুরুষেরা পায় 'পট দেখিয়ে গান শুনিয়ে ... 'খিতান' করলে চাল-ডাল পায়, খাবার, কিছু নগদ পয়সা।' আর নারীরা 'দূর গাঁয়ে আলতা-সিঁদুর-চুড়ি, দেশলাই-বিড়ি নিয়ে নিয়ে পৌঁছে যায়।' পটুয়ারা মুসলিমদের মসজিদে যেতে পারে না অথচ মৃত্যুর পর কবরে যায়। শুয়োর খায় না, গো মাংস খায়। ভগবানের ছবি আঁকে, গান বাঁধে। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল-সকলের সঙ্গেই ছেলে মেয়েদের বিবাহ হয়। চৈত্র, ভাদ্র মাসে বিয়ে বাদ, সুন্নত করা বাধ্যতামূলক। আসলে শিল্পীর কোন জাত হয় না, হয় না কোনো ধর্মও। একসময় গল্পের নায়ক রাধেশ্যামের মনে হয় 'ইদানিং কাহিনীর ঘোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সে মাঝে-মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করতে চায়-আসলে আমি কি রাধেশ্যাম, নাকি রহিমতুল্লা।' আর এই প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই বের করে। তাই গল্পে তিনবার বলতে শুনি 'আমরা শিল্পী', 'আমি শিল্পী', 'আমরা শিল্পী'। নিজের ঠিকানা লেখার সময় লেখে 'রাধেশ্যাম চিত্রকর গ্রাম নয়া থানা পিংলা জেলা মেদিনীপুর।' তার একমাত্র পরিচয় সে চিত্রকর।

কিন্নর রায়ের যে প্রকৃতি প্রেম তাকে প্রেম না বলে সচেতনতা বলাই ভালো। 'এই বিষয়ে তিনি বোধহয় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে জাহাজের মাস্তুলের মতো সঙ্গীহীন, একক।' পলিথিনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও তার কুফল নিয়ে তাঁর গল্প 'অনন্তের পাখি'। পলিপ্যাক তাদের নিজের সমস্যা নিজেই ব্যক্ত করেছে – 'খবরের কাগজ, এমনি কাগজের ঠোঙা পচে। শালপাতা পচে। মাটিতে মিশে যায়। আমরা তো সহজে পচি না। আমরা এবার কোথায় যায় অনন্তবাবু?' সমাধানের পথ ও বলেছে পলিপ্যাক-'না পোড়ালে মেশিনে ঢুকিয়ে নতুন করে ক্রিস্টাল না বানালে তো আমাদের-' সুকৌশলে তিনি 'পচনশীল'(Degradable) এবং 'পচনশীল নয়'(Non-degradable) এমন দুই প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব ও তাদের ব্যবহারের সুফল কুফল তুলে ধরেছেন। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি যে প্রথম লিখেছেন তা নয়, তবে তাঁর প্রকাশভঙ্গি অভিনব। ব্যাখ্যা বা বর্ণনা না করে পলি প্যাকের মুখ দিয়েই কথাগুলি বলিয়ে নিয়েছেন।

কিন্নর রায়ের গদ্য সাংবাদিক গদ্যের মতো বর্ণনা নির্ভর। ডিটেলিং তিনি খুব পছন্দ করেন। 'দর্পণে নীল' গল্পে-

"চা খেতে খেতে বাবুল বলল, নীল বিদ্রোহ হয়েছে ১৮৫৯-৬০। ধরুন আজ থেকে একশো চল্লিশ বছর আগে। ...বাংলার কৃষক অত্যাচারী সায়েব নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ...চায়ের কাপ ঠোঁটে ছুঁইয়ে বাবুল বলল, যাই বলুন না কেন, অবিভক্ত বঙ্গের যশোর আর নদীয়া ছিল নীল বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র।ঐ অঞ্চলে বহু নীলকুঠি ছিল এক সময়। ছিল কুঠিয়ালদের অত্যাচার। জোর করে নীল চাষে বাধ্য করা হ'ত চাষীদের। নীল দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম ১৮৩০। মারা যান ১৮৭৩ এ। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তার জন্ম নদীয়ার চৌবেড়িয়ায়। প্রথম চাকরি করতেন ডাকবিভাগে।পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইনসপেক্টর।"[১৩] এই ভাবেই পাতার পর পাতা বর্ণনা দিয়ে চলেন কিন্নর রায় প্রতিটি গল্পে।'নির্বাণ' গল্পে বড় ভন্ত মারা গেছে। সাংবাদিক মানস রায় গেছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে। এই গল্পে বড় ভন্ত সম্পর্কে যেমন ডিটেলে বহু তথ্য মেলে তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম ও তার সমস্যা নিয়ে বহু তথ্য মেলে।

"হলুদ মলাটের চটি বই। এক বিঘদের অর্ধেক হবে লম্বায়। ষোলটি পাতা আছে মোট।
প্রথম পাতায় লেখা-তিনি ১৯০১ সালের ২৭ শে জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ি থানার ধর্মপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার প্রথম সন্তান। '... ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির আহ্বানে পটিয়া থানার সাতবাড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় 'বৌদ্ধ মহাসভা'। সেই সভায় তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এই সভায় তিনি সভাপতি রূপে এক গুরুত্ব পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। পড়তে পড়তেই মানস কানের পাশে আবারও মঞ্চ থেকে মাইকে ভেসে আসা কথা শুনতে পেল। '১৯৫৬ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে ২৫০০ বুদ্ধ জয়ন্তী শুরু হয়। ভারতেও এর ঢেউ এসে লাগে। এই সময় ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। মহাস্থবির বড় ভন্তে এই সময়ে নবদীক্ষিত এই সব বৌদ্ধদের বৌদ্ধ ধর্মের আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়ার জন্যে মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত সমস্ত অঞ্চল সফর করে নব্য বৌদ্ধদের বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান শেখান। তখনই নব্য বৌদ্ধদের সঙ্গে বাঙালি বৌদ্ধদের আত্মিকযোগ তৈরি হয়, তাঁর উদ্যোগে। অনেককে উপসম্পদাও তিনি দেন।'... মানস ভন্তে বিনয়শ্রীর দেয়া মহাস্থবিরের জীবন পড়তে পড়তে দেখতে পেল ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার সাতবাড়িয়ায় যে ধর্মসভা হয় তাতে মহাস্থবির বলেছিলেন, ' ভারত... রাজনীতিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে সর্বোপরি শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তখন, যখন ভারত সাম্রাজ্য বৌদ্ধ দর্শন, পৃথিবীর কাছে ভারত শ্রদ্ধাভাজন বৌদ্ধ আদর্শের জন্য। বৌদ্ধ সভ্যতার জন্য।
"...বৌদ্ধ ভারতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শৌর্য বীর্য গেল, স্বাধীনতা গেল, অনৈক্য ও অসামান্যতায় ভারত শতধা বিভক্ত হইল। দুর্দশার অবধি রহিল না। ...এই ধর্মেরই প্রভাবে একদিন বৃহত্তর ভারত পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা হল বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ।"[১৪] 'নির্বাণ' গল্পে বাজারের বর্ণনা দিচ্ছেন তাও কত নিঁখুতভাবে- "রবিবারের সকাল সাড়ে দশটা। ভরা বাজার। প্রচুর ভিড়। বাজারে কমলালেবু এসেছে। শীতের সবজি – নতুন আলু বাদ দিয়ে ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, সবুজ সবুজ নতুন সিম, শুধু শীত নেই। রাস্তার গায়ে ফুট পাথের ওপর ছাল ছাড়ান-ড্রেসড ব্রয়লার। লালচে ঠ্যাঙ, বুক, পেট-সব আলাদা আলাদা পিস করে অ্যাকোয়রিয়াম চেহারার বাক্সের ভেতর। ফাইবার গ্লাসের চৌকো মতো বাক্স। তার ভেতর চিকেনের টুকরো। মাছি, ধুলো পড়বে না।"[১৫]

কিন্নর রায়ের গল্প উপন্যাস গুলির বিশেষ আকর্ষণ বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব। সচরাচর যে সব বিষয় নিয়ে বিশেষ কেউ লেখেন না-কারণ লিখলে বাজারি সাফল্যের সম্ভাবনা কম-কিন্নর রায়ের আগ্রহ যেন সেগুলির প্রতিই বেশি। ধর্মসংকট(১৯৯২) এক মাঝ বয়সি মুসলিম চাকুরিজীবীর একটি ভয়ার্ত দিনের কাহিনি। মনজুর হাসান ফ্লাশব্যাকে গেছে ১৯৬৪-৯০।

ফ্ল্যাশব্যাক-১

১৯৬৪ সালে 'হজরত বাল' নিয়ে দাঙ্গা

ফ্ল্যাশব্যাক-২

১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধ

ফ্ল্যাশব্যাক-৩

১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ

ফ্ল্যাশব্যাক-৪

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

ফ্ল্যাশব্যাক-৫

রামমন্দিরের জন্য ইট জড়ো

ফ্ল্যাশব্যাক-৬

স্কুল প্রেম- 'আমার জীবনেও তো অনেক অপমান আছে। ব্যাচ মেট শ্রেষ্ঠা সেন আমার হোল না শুধুই আমার নামটি মনজুর হাসান বলে-আমি তো নিজের নাম ভাঁড়াতে পারিনি।

অভিমান-১

মুসলিম হলেই বিপদ- আমরা গোমাংস খায়, তাই নাকি আমাদের শরীরের গরম বেশি। সন্তান অনেক, বুদ্ধি কম, হিন্দু ছাড়া ইহুদি, খ্রী ষ্টান রাও তো গো-মাংস খান। কই তাদের বেলায় তো এমন কথা বলেন না।

অভিমান-২

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা- সেই ইউনিভার্সিটিতে ক্যান্টিনে শ্রেষ্ঠার সামনে, সে যেন কত বছর আগে-তোমাকে দেখে মনে হয় না তো তুমি মুসলমান- এরকম কোন অপমান যদি আমাকে ফুঁড়ে ফেলে।

আক্ষেপ-১

স্ত্রী এবং বান্ধবীকে নিয়ে- 'আমি তো নাসিফারও, শ্রেষ্ঠারও। ভারতবর্ষ কেন এমন হয় না। ... কেন গৈরক আর সবুজের অকারণ রক্তক্ষয়ী তরজায় আমরা মেতে থাকি? এতে কি দেশ থাকে। থাকবে।

আক্ষেপ-২

ওরা আমরা'র ভেদ রয়েই গেছে-দেয়ালে বিজ্ঞাপনে যতই লেখা হোক না কেন, ...ওরা পারল না আমরাও তো পারিনি। 'ওরা', 'আমরা' আজও ভুলতে পারিনি। সব মিলিয়ে আমাদের তো হল না...।

আজ হিন্দু মুসলিমের সম্প্রীতির অভাব, মুসলিম মৌলবাদীদের রয়েছে ফতোয়া, তেমনি কট্টর হিন্দুবাদীদেরও রয়েছে ঘৃণা। অথচ একদিন হিন্দু মুসলিম মিলে করেছে দুর্গাপুজো। বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ের দুর্গাপুজো করছে এক মুসলিম পরিবার সাত পুরুষ ধরে। কিন্তু আজ সেই পুজোতে আর তারা অংশগ্রহণ করছে না। এই ঘটনা নিয়ে কিন্নর রায় লিখলেন 'ধর্ম' (২০০০) গল্পটি।

সমুদ্রগড়ের রাজা রঞ্জিত ভট্টঠাকুর এবং নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ একবার গ্রেপ্তার করেন কর না দেওয়ার অপরাধে। হুমকি দেন, যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে তাদের ধর্মান্তরিত করা হবে। সেই শেষ দিনে সূর্যাস্তের আগেই সমুদ্রগড়ের রাজার দেওয়ান সমস্ত অর্থ যোগার করে এনে উপস্থিত হন। কিন্তু নদীয়ার রাজা পারেননি। তখন রাজা রঞ্জিত ভট্টঠাকুর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তার প্রতি। সমস্ত অর্থ দিয়ে দেন নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে। এর ফলে নিজের ধর্ম অক্ষুন্ন রেখে রাজা রামকৃষ্ণ ছাড়া পেলেও, রাজা ভট্টঠাকুর হয়ে যান আতাহার খান। একজন মুসলমান হয়ে ছাড়া পেলেও রাজা রঞ্জিত ভট্টঠাকুর হয়ে যান আতাহার খান। মুসলমান হয়ে গেলেও ভট্টঠাকুর ওরফে আতাহার খান কিন্তু বন্ধ করেননি তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজোটিকে। ...এর পর ধরে হয়ে চলেছে সেই দুর্গাপুজো। আতাহার খানের বংশধর সলিল খান এবং তার আত্মীয়-পরিজনেরা পরবর্তী কালে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আজ সেই দুর্গাপুজোর অস্তিত্ব বিপন্ন, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে কলুষিত।

এইভাবেই বিপুল বিষয়ের সম্ভার নিয়ে শুধু নয়ের দশকে নয়, আজও কিন্নর রায় তাঁর ছোট গল্পের ডালি সাজিয়ে চলেছেন। তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কে স্বমন্তব্য দিয়েই আলোচনার ইতি টানলাম- 'জীবন তো নিছকই এক যাত্রা মাত্র।

...তবে দর্শনহীন, দার্শনিক জিজ্ঞাসা বিহীন, নিছকই আজ্ঞাবহ জীবন-সেও তো ভার-বোঝা শুধু। দলতন্ত্র, দলদাসত্ব যখন গ্রাস করে মনুষ্যত্বকে,মানুষ তখন মুক্তির দরজা খুঁজে ফেরেন।সচেতন মানুষ ঠিক নিজের রাস্তা খুঁজে নেন।আমার সেই খোঁজ প্রক্রিয়া চলেছে আজও।চলবে সাড়া জীবন,গোটা জনম ভর।'[১৬]

তথ্যসূত্রঃ-

১। অরুণ মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকাঃ ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১, কোলকাতা, পৃ ৩৯৭
২ অরুণ মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ ১৩৭
৩ কালের পুত্তলিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪০
৪ কালের পুত্তলিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২৩
৫ রণজিৎ অধিকারি সম্পাদিত 'পূর্ব', ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ২০১২, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃ ১৩৬
৬ পূর্বোক্ত, 'পূর্ব', পৃ ১৫০
৭ পূর্বোক্ত, 'পূর্ব', পৃ ২০১
৮ পূর্বোক্ত, পূর্ব, পৃ ১৩৯
৯ কিন্নর রায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং,১ম প্রকাশ ২০০৩, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ২০১১, পৃ ৭২
১০ পূর্বোক্ত, পূর্ব , পৃ ১৩৩
১১ পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ৪৬-৪৭
১২ পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ২১
১৩ পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ৩৮-৪১
১৪ পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ২৬-২৭
১৫ পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ২০
১৬ পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ১৪